প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

১৭ এপ্রিল, ২০২১

করোনার দ্বিতীয় তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে। কোথাও নাকি তৃতীয়-চতুর্থও। সরকার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রথম তরঙ্গের আঘাতজনিত অভিজ্ঞতা এত সহজে ভুলে যাওয়ার কি? সেই অপরিকল্পিত লকডাউন, দৈনন্দিন জীবনে হা-হুতাশ, পরিযায়ীদের পথেই জীবন পথেই মরণ, বাড়ির দুয়ারে অচ্ছুত করোনা রোগীর মৃত্যু, মুমূর্ষু সন্তানকে হাসপাতালে ভর্তি করতে অপারগ মায়ের আত্মহত্যার হুমকি কিংবা শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে চিকিৎসকের করোনাতে মৃত সহকর্মীর দেহের অন্তিম সংস্কার— কোন স্মৃতিটা সুখের!

আমরা কি ঠেকে শিখছি না যে জনজাগরণ ছাড়া উত্তরণের পথ নেই? শুধু নিজে সচেতন হলে হবে না। একই সাথে তা করতে হবে আপামর জনসাধারণকে। আর সেই লক্ষ্যেই স্টুডেন্টস্ হেল্‌থ হোমের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। রাষ্ট্রনায়কের বাগাড়ম্বরই সার, ২১ দিনে যুদ্ধ শেষ হল কই?

২১ মাস না ২১ বছর যুদ্ধ চলবে তা নির্ভর করবে সমষ্টির আচরণের ওপর। আমরা অন্তত কাঠবেড়ালি সৈনিকের দায়িত্ব পালন করি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্যাস পুষ্ট স্টুডেন্টস্ হেল্‌থ হোম (হোম) ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নিরবিচ্ছিন্নভাবে ছাত্রস্বার্থে কাজ করে চলেছে— সাধারণের স্বার্থেও। এই উদ্যোগ তারই অঙ্গ।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

১৬ জুন, ২০২১

করোনা দ্বিতীয় ঢেউ পুস্তিকাটি পাঠকমহলে বিশেষ সমাদৃত। প্রথম সংস্করণে ১৫,০০০ কপি প্রকাশের সাথে সাথে নিঃশেষিত। সময়ের দাবি মেনে পরবর্তী সংস্করণে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের আতঙ্ক, সম্ভাব্য তৃতীয় ঢেউয়ে শিশুদের সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কার বাস্তবতা এবং কোভিডযোদ্ধা স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পরামর্শ সংযুক্ত করা হল।

ডা: গৌতম মুখোপাধ্যায়
সভাপতি

ডাঃ পবিত্র গোস্বামী
সাধারণ সম্পাদক

স্টুডেন্টস্ হেল্‌থ হোম

জীবন যুদ্ধেরই অঙ্গ

মানুষের জীবন মাঝে মাঝে এমন সময়ের মধ্যে দিয়ে যায় যে তখন মনে হয় বুঝি আর কখনও এ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। অভিজ্ঞতা কিন্তু বলছে কীভাবে একটি বিষয় অথবা ঘটনাকে দেখছি তার ভিত্তিতেই ঠিক হয়ে যায় পরিস্থিতি কতটা চাপ তৈরি করবে। প্রশ্ন হল, এই চাপ কি বাইরের? নাকি চাপের উৎস আমাদের পরিস্থিতি বাগে আনতে গেলে যতটা আত্মবিশ্বাস দরকার সেটুকুর ঘাটতি? দীর্ঘ বছরকাল জুড়ে অতিমারি যাপন করতে গিয়ে আমরা পরিষ্কার দুটো দিক দেখতে পাচ্ছি যার প্রথমটি অনিশ্চয়তা, দ্বিতীয়টি অবশ্যই এর স্থায়িত্ব! হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে যে লাভ হয় না সেটা আমরা জানি। পরিস্থিতি অস্বীকার করেও যে ভোগান্তি কমবে না তাও অ্যাদ্দিনে বেশ বোঝা গেছে, তবে? এই 'তবে'-র জায়গা থেকেই বাস্তবকে মেনে নেওয়ার শুরু, যার প্রথমটি 'অ্যাকসেপ্টেন্স', গ্রহণ করার ক্ষমতা— 'সত্যেরে লও সহজে'! গতবছর ঠিক এই সময় মানুষ যখন প্যানিকাক্রান্ত, ঘরবন্দি এবং ঘটনার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রহিত, তখন কাঠামোর ঘাটতিই কিন্তু সবচেয়ে বড়ো সংকট তৈরি করেছিল। প্রাণী হিসেবে আত্মমূল্য নিয়ে টিকে থাকতে গেলে যেমন উদ্দীপনা— উদ্দীপক, স্বীকৃতি এসবের দরকার হয়, তেমনি একটা স্ট্রাকচার বা কাঠামোর খিদে লাগে। এটুকু না থাকলে যত প্রেষণা— প্রেরণাই থাক না কেন সব কাজেরই খেই হারিয়ে যায়। দৈনন্দিন রুটিনে অভ্যস্ত মানুষের তাইই হয়েছিল করোনার প্রথম ধাক্কায়। যাঁরা এই ধাঁচাটি নতুন করে তৈরি করতে পেরেছিলেন তাঁরা অতি অবশ্যই সাপের মাথায় পা রেখে নেচেছিলেন এবং নিজেদের অতিক্রমও করেছিলেন এ সত্য আমরা জানি। এবারের ধাক্কাও যদি এমনটাই হয় তবে কি বাড়তি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমরা লড়াইটা লড়তে পারব না?

দ্বিতীয় দিকটা হল, একা একা স্বার্থপরের মতো বাঁচা না, অন্যের জন্য নিজের কিছুটা সময় রাখার প্রয়োজনীয়তা অতিমারিই শেখাল আমাদের— এবার শুরু দৈনন্দিন জীবনে তা অঙ্গীভূত করার। কঠিন দিনে মনের চাপ বৃদ্ধি অস্বাভাবিক নয়, কেবল তা বন্যার স্রোতকে সেচ খালে বইয়ে দেওয়ার মতো করে চালনা করাটাই আসল। তাই অযথা প্যানিক না করে বিজ্ঞানের পথটি ধরুন। দুনিয়ার সবকিছু আপনার আমার নিয়ন্ত্রণে নেই, কিন্তু যেটুকু আপনি পারেন সেটুকু করছেন না কেন? ন্যূনতম স্বাস্থ্য এবং প্রতিরক্ষা বিধি মানতেই বা এত অনীহা কেন?

গত একবছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধে বড়ো কম হচ্ছে না। অনলাইন ক্লাস এবং প্যাথলজিক্যাল ইন্টারনেট ইউজ হাতে হাত মিলিয়ে এখন জলভাত! পরীক্ষা কোথাও হচ্ছে, কোথাও এমনভাবেই হচ্ছে যে ভেতরে ভেতরে মুষড়ে পড়ছে আগ্রহী ছেলেমেয়ের দল। হতাশা বাড়ছে। এর পরিবর্ত পথ হিসেবে কিন্তু বহু কিছু আছে যা পুঁথি পাঠ এবং গতে বাঁধা ধাঁচের বাইরে। বড়োদের দায়িত্ব হল ওদের অনেকটা ভরসা করা। দায়িত্ব শেয়ার করা। বিগত কয়েক দশক ধরে বড়োরা ছোটোদের পড়াশুনার বাইরে আর কিছুই ভাবেননি। যে কোনো মূল্যে একটা রেজাল্ট চাই, তাহলেই চলবে যেন! এর ফাঁকে যারা বড়ো হয়ে উঠলেও প্রায় ক্ষেত্রেই কোনো দায়িত্ব নিতে শেখেনি, সংসার কীভাবে চলে তা ভাবার চেষ্টাই কি করেছে? আজ যখন সুযোগ এসেছে তখন সংসার নামক টিমটার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠুক, জীবন গড়ে উঠবে।

আজকের ছোটোদের মূল সমস্যা পড়াশোনা নিয়ে নয়, আবেগ নিয়ন্ত্রণে, রাগের দায় নেওয়ায়, ফ্রাস্ট্রেশন টলারেন্সের অপারগতা। তাই এত পালাই পালাই, এত অস্থিরতা, অবসাদ! ভালোমন্দ যাইই আসুক মেনে নেওয়ার মনটাই তৈরি হয়নি ও বেচারাদের। তাই ওরা আজ যখন সুযোগ পেয়েছে তখন অন্তত ধৈর্যের শিক্ষাটা পাক, জানুক, 'যে সয় সে রয়'-এর নীতি। ক্রিস্টালাইজড ইন্টেলিজেন্সকে ছাপিয়ে উঠুক সোশ্যাল ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স! অন্যের মনটাও বুঝুক না! দেখুক, কত কিই শেখা যায় পুঁথির পাতার বাইরে, হয়ে উঠুক পরিবারের খুটি!

বড়ো বাজে বকলাম হয়তো। তবু জানিয়ে রাখি, সব কিছুর মতো কোভিড-সময়ও চলে যাবে একদিন না একদিন, ইতিহাস তাই বলছে। ইতিহাস এও বলেছে, আজ থেকে কয়েক শতাব্দী আগে মহামারিতে কেমব্রিজের মতো ইউনিভার্সিটিও বন্ধ হয়ে গেছিল। অন্তত দেড় বছর খোলেনি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা। এদেরই এক ছাত্র এই অবসরে চলে গেছিল তার দিদিমার কাছে— গ্রামের বাড়িতে। ছেলেটি মেতে থাকত অঙ্কের খাতায়, বাগানে ঘুরত। সেখানেও অঙ্ক, এমনকি গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখলেও মাথায় ঘুরত অঙ্ক! মজার কথা দুনিয়ার লোকে আজও ওই আপেল গাছ দেখতে যায়, কারণ ছেলেটার নাম আজ সবাই জানে, নিউটন! মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্বটা ওই সময়ই আবিষ্কার হল কিনা! পরীক্ষা বন্ধ, কলেজ বন্ধ বলে হতাশায় ডুবে থাকলে কি আর সেসব হত?

■ করোনা আবার ফিরে আসছে কেন? তৃতীয়, চতুর্থ তরঙ্গ কি চলতেই থাকবে?

করোনা একটি সর্দি-কাশির ভাইরাসের গ্রুপের RNA ভাইরাস। এরা খুবই ছোঁয়াচে এবং এদের জিনগত পরিবর্তন অর্থাৎ মিউটেশন করার ক্ষমতা খুব বেশি তাই ফিরে আসতেই পারে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলতে থাকে, একসময় এই ভাইরাসের ক্ষতি করার ক্ষমতা (virulence) এবং ছোঁয়াচে ভাব (infectivity) কমে আসে। তখন ভাইরাস endemic হয়ে যায়, অর্থাৎ আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃত্যুহার অনেক কমে যায়।

■ দ্বিতীয় তরঙ্গ কি প্রথমের থেকে বেশি ক্ষতি করবে?

দ্বিতীয় তরঙ্গে বেশি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লেও মৃত্যুহার বা মারাত্মক আক্রান্ত হওয়ার হার কম হওয়ার আশা। তবে চূড়ান্ত বলার সময় এখনও আসেনি। চিকিৎসা পরিকাঠামোও আগের থেকে প্রস্তুত থাকারও কথা ছিল।

■ ঠিক কীভাবে ছড়াচ্ছে আর কীভাবে ছড়াচ্ছে না?

প্রধানত ছড়ায় কাছাকাছি আসা মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস, হাঁচি-কাশির মাধ্যমে। দ্বিতীয় এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ হল হাত বা common touching surface যেমন সুইচ, দরজার হাতল ইত্যাদি।

জামাকাপড়, খাবার, খবরের কাগজ, টাকা, বই ইত্যাদি থেকে ছড়ায় না। এই ছোঁয়াছুঁয়ি আর ধোয়াধুয়ি মানতে গিয়েই গতবছর আমাদের পাগল হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। যদি মনে করি সঠিকভাবে মাস্ক পরা আর সম্ভব হলে দূরত্ব বজায় রাখাটাই আমার প্রধান কাজ তাহলে ব্যাপারটা মোটেই কঠিন না।

■ স্কুল, পাঠশালা, খেলাধুলাহীন শিশু কিশোর কী করবে?

সিলেবাস বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ যেমন— গান করা, লেখা, বই পড়া, বন্ধুদের সাথে সংযোগ করা এবং অবশ্যই বাবা-মায়ের সাথে টিভি দেখা দরকার। ওদের কাজে কিছুটা অমনোযোগ আবার ভেবেচিন্তে নজরদারি দুটোই দরকার।

■ দৈনন্দিন কাজ করেও করোনাকে কীভাবে এড়ানো যায়?

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ :

- বাইরে সবসময় নাক, মুখ ঢেকে মাস্ক ব্যবহার।
- পরস্পরের মধ্যে দুই মিটার দূরত্ব বজায় রাখা।

- বাইরের কাজ করার পর কব্জি পর্যন্ত সাবান দিয়ে কচলে কচলে হাত ধোওয়া।
- বাইরের কাজ চলাকালে মুখে হাত না দেওয়া ও সিগারেট, বিড়ি না খাওয়া। এগুলি এবং মদ ইমিউনিটিও কমিয়ে দেয়।
- নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খাওয়া।

কম গুরুত্বপূর্ণ :

- বাইরের কাজের জন্য আলাদা জামাকাপড় ব্যবহার এবং বাড়িতে এসেই সেগুলো সাবান জলে আধঘণ্টার বেশি ভিজিয়ে রেখে কাচা বা আলাদা করে রাখা।
- অনিবার্য কারণে মুখে হাত দেবার দরকার হলে কনুই বা কাঁধ ব্যবহার করা।
- মোবাইল ফোন বাড়ি ফিরে হ্যান্ডওয়াশ বা স্পিরিট দিয়ে মোছা বা প্লাস্টিক কভারে নিয়ে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে সেটি খুলে ফেলা।
- হাতঘড়ি, আংটি, বালা, তাগা না পরাই ভালো, পরলে বাড়তি সাবধান হতে হবে।
- মানিব্যাগ বা চশমা বাড়িতে ঢোকার পর আলাদা প্লাস্টিক কভারে রেখে দেওয়া।
- বাজার থেকে এসে ব্যাগ-সহ সমস্ত সবজি আধ ঘণ্টা খাবার সোডার জলে ভিজিয়ে রাখা, পরে ধুয়ে ফেলা।

বি. দ্র. : যদি কেউ মাস্ক পরে মিষ্টি বানান এবং দেন বা গরম মিষ্টি খান বা ফল জাতীয় জিনিস ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে খান, সেক্ষেত্রে কোভিড হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কোভিড হাঁচি কাশির ফলে উদ্ভূত ড্রপলেট (জলকণা) বা এরোসল (ভাসমান ক্ষুদ্র জলকণা) দিয়ে মূলত ছড়ায়। পাশাপাশি ড্রপলেট কোনো বস্তুতে থিতিয়ে পড়লে বা হাতে লাগলে সেই বস্তু বা হাত থেকে চোখ-নাক-মুখের সংস্পর্শে কোভিড ছড়ায়। খাবারের মাধ্যমে (ফিকো ওরাল রুট) কোভিডের কোনো ট্রান্সমিশন দেখা যায়নি।

ভিড় এড়িয়ে চলুন। বাজার বা অত্যাবশ্যকীয় কাজ করুন কিন্তু সমস্ত সাবধানতা মেনে।

অফিসের এসি চললে সেখানে অনেক মানুষের ভিড় করতে দেবেন না। বদ্ধ ঘরে এসি চললে করোনা কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বেশি ছড়ায়।

এসি এরোসল তৈরি করতে পারে এবং একই হাওয়া বারবার ব্যবহার করে তাই পারতপক্ষে এসি না চালানো, বা চালালেও সবাই মাস্ক পরে থাকা আবশ্যক। যেসব

জায়গায় এসি চালাতেই হবে সেখানে হেপা ফিল্টার যুক্ত এসি চালানো ও ওই ফিল্টার মেন্টেন করা আবশ্যিক।

■ সব সাবধানতা মেনে চললেও কি কোভিড হতে পারে?

হ্যাঁ হতে পারে। তার কারণ আপনি হয়তো সমস্ত নিয়মকানুন মানছেন, কিন্তু আপনার সঙ্গী-সাথীরা সমস্ত নিয়ম মানছেন না। তাই আপনার দায়িত্ব শুধু নিজে মানলে হবে না সবাইকে কোভিড আচরণবিধি সম্পর্কে অবগত করুন এবং প্রত্যেকটি বিধি মানতে বাধ্য করুন।

■ করোনার প্রাথমিক উপসর্গগুলি কী কী?

জ্বর, সর্দি, কাশি, গা-হাত-পায়ে ব্যথা, গাঁটে ব্যথা, পাতলা পায়খানা, খিদে কম, কানে ব্যথা, হঠাৎ করে চুলকুনি বা র‍্যাশ, গলা ব্যথা, গলা খুসখুস, খিদে কম, চোখ লাল, বমিভাব, স্বাদ বা গন্ধ না পাওয়া।

■ প্রাথমিক উপসর্গ দেখা গেলেই কি করোনা পরীক্ষা করবেন?

করতে হবে। কারণ অনেক সময় এক দু'দিনের মধ্যেই সব উপসর্গ চলে যায় আর সংক্রমিত ব্যক্তির কোনো সমস্যা থাকে না। সেক্ষেত্রে তার থেকে বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিদের সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়।

■ প্রাথমিক উপসর্গ দেখা দিলে কি করবেন না?

আপনি অন্তত ৭ থেকে ১০ দিনের জন্য কারোর সঙ্গে মেশামেশি করবেন না যদি টেস্ট না করেন।

■ আপনার উপসর্গ দেখা দিলে ঘনিষ্ঠদের কী বলবেন?

আক্রন্ত মানুষটি পরিবারের অন্যান্য যাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের নজরদারির আওতায় আনতে হবে। তারা যতটা সম্ভব আলাদা আলাদা এবং দূরে দূরে থাকবেন। আক্রান্ত মানুষটির ব্যবহার করা কোনো জিনিস কেউ ব্যবহার করবেন না। সকলেই নিয়মিত মাস্ক ব্যবহার করবেন। যদি বাড়ির সদস্যদের মধ্যে পাওয়া যায় ভালো, নতুবা একজন কাউকে সেবার জন্য আলাদা করে নিয়োগ করা দরকার। তিনি নিয়মিতভাবে অসুস্থ মানুষটির শারীরিক অবস্থা নজরে রাখবেন। তাঁর নাড়ির গতি, হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসকার্য লক্ষ্য রাখবেন। এক্ষেত্রে থার্মোমিটার ও পাল্‌স অক্সিমিটার ব্যবহার করতে হবে। বাড়ির অন্যরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি মেনে চলবেন।

■ কোথায় পরীক্ষা করাবেন?

সরকারি হাসপাতালগুলিতে এই রোগের নির্ধারিত পরীক্ষা করা হচ্ছে। নিজের নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতালে গিয়ে নিজের নাম করোনা পরীক্ষার জন্য নথিভুক্ত করে এই পরীক্ষা করা সম্ভব। সরকারের নিয়ম মেনে কিছু বেসরকারি ল্যাবরেটরিও এই পরীক্ষা করাচ্ছে। তবে বেসরকারি জায়গায় করোনা RT PCR করার জন্যে নির্ধারিত খরচ ৯৫০ টাকা।

■ রোগ নিশ্চিত হবার আগে নিজে কোনো ওষুধ শুরু করবেন কি?

সমস্যা না থাকলে কোনো ওষুধ শুরু করার দরকার নেই। বরং দ্রুত রোগ নির্ণয় করে তারপর নির্দিষ্ট ওষুধ শুরু করাই উচিত। অবশ্য ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি জ্বরের জন্য paracetamol tablet শুরু করা যেতে পারে।

■ রোগ নিশ্চিত হলেও চিকিৎসকের কাছে যাওয়া সম্ভব না হলে কতদূর নিজে যত্ন নিতে পারেন?

এক্ষেত্রে vitamin C এবং zinc tablet দিনে ১টি করে চালু করা যেতে পারে (placebo)। জ্বর থাকলে Paracetamol 650 দিনে তিন বার এর বেশি না। তবে অন্যান্য ওষুধ বিশেষত antibiotic ডাক্তারের পরামর্শেই শুরু করা উচিত। ডাক্তারবাবুর সাথে টেলিমেডিসিন মারফত যোগাযোগ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সরকারের একটি নির্ধারিত হেল্প লাইন ২৪ ঘণ্টা চালু আছে। তাই যতটা দ্রুত সম্ভব ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

■ চিকিৎসক বাড়িতেই থাকার পরামর্শ দিলে কী কী করবেন আর কী করবেন না?

সম্পূর্ণ আলাদাভাবে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। নিজের আলাদা ঘর এবং আলাদা বাথরুম ব্যবহার করতে হবে। বাড়ির বাকি লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ ন্যূনতম মাত্রায় রাখতে হবে। ঘরের বাইরে বেরলে যেমন— খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকার জন্যে, অবশ্যই মুখে মাস্ক পরে বেরোবেন। বাড়ির লোকজনকেও কিন্তু একইভাবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। খাবার বা জল ইত্যাদি করোনা রুগির ঘরের সামনে এনে রেখে দিতে হবে, যাতে রুগি সেটি সময়মতো দরজা খুলে নিতে পারেন এবং একইভাবে

বাইরে বের করে দিতে পারেন। এই সমস্ত থালা-বাটি বা জামাকাপড় সাবান দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। কোনো সমস্যা হলেই ভর্তি হওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করুন।

■ কখন ভর্তি হতেই হবে?

যদি শ্বাসকষ্ট হয়, খুব বেশি জ্বর থাকে বা অনবরত পাতলা পায়খানা হতে থাকে এবং এগুলির কোনো একটি হলেই ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করাই উচিত।

বিশেষত যদি অক্সিজেনের ভাগ রক্তে ৯৪% এর নীচে নেমে যায় তবে অবশ্যই ভর্তির কথা ভাবতে হবে।

এছাড়া যদি বাড়িতে আলাদা করে থাকার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে রুগির কোনো সমস্যা না থাকলেও তার ক্ষেত্রে সেফ হোমে ভর্তি হওয়া উচিত, এতে রোগ বাকিদের মধ্যে ছড়ানোর সম্ভাবনা কমবে।

■ ভর্তি হবার উপায় কী?

নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন। ভর্তির জন্য সরকারি হেল্পলাইন নম্বরটা হল 1800313444222— এখানে ফোন করে ভর্তির জন্য রুগির নাম নথিভুক্ত করুন।

■ বাড়ির কেউ করোনা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে অন্যেরা কী করবেন?

অযথা ভয় পাবেন না তবে আপনি হাই রিস্ক (কোমর্বিডিটি যুক্ত হলে বা বয়স্ক হলে বা ইমিউনোলজিক্যালি দুর্বল হলে) রুগির সাথে ও তাঁর চিকিৎসারত টিমের সাথে যোগাযোগ রাখুন ফোনের মাধ্যমে। রুগিকে ভরসা দিন। রুগির প্রয়োজনে আপনাকে হাসপাতালে যেতে হবে, সেক্ষেত্রে কোভিড সংক্রান্ত সমস্ত বিধি (মাস্ক পরা, হাত ধোয়া, চোখে মুখে হাত না দেওয়া, প্রয়োজনে পিপিই পরা) মেনে চলুন। কোভিড পরিস্থিতিতে সমস্ত হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীরা অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছেন তাদের সহযোগিতা করুন। পারলে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করুন।

■ প্রতিবেশী কেউ আক্রান্ত হলে আপনি কী করবেন?

কোভিড রুগি অস্পৃশ্য না। এই রোগ যেকোনো সময় আমার আপনার যেকোনো লোকের হতে পারে। তাই তাঁদের সাথে বাজে ব্যবহার করবেন না। তাদের অকারণ দোষারোপ, বা একঘরে করে দেবেন না। শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখেও বন্ধুত্বের হাত

বাড়ানো যায় সেটা হোম কোয়ারান্টাইনের সময় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে দেওয়া হোক বা ফোনের মাধ্যমে গল্প করে তাদের উৎসাহবর্ধন করা হোক।

তবে যদি আপনি উক্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন, বিশেষ করে মাস্ক ছাড়া তাহলে টেস্ট করান।

■ হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলে কী কী করবেন এবং কী কী করবেন না?

যতটা সম্ভব বিশ্রাম নেওয়া, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, প্রতিদিন নিজের পরিচর্যা করা, প্রয়োজনীয় ওষুধ খাওয়া আর শ্বাসের ব্যায়াম করা আবশ্যিক। সাধারণভাবে হাসপাতাল থেকে নেগেটিভ হয়ে বাড়ি ফেরার ১০ দিন পর অবধি আপনার নিজেকে কোয়ারান্টাইনে রাখা দরকার। মাস্ক ছাড়া কোথাও যাবেন না। হাত বারবার ধোয়া আবশ্যিক।

যদি বুকে ব্যথা হয়, কাশি কমতে না চায়, শ্বাসকষ্ট ক্রমশ বাড়তে থাকে, অবিলম্বে ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ নিন।

আপনি যদি ৪৫ বা তার বেশি বয়সের হন, তবে সেরে ওঠার ৩ মাস পরে অবশ্যই কোভিড টিকা নিন। খুব পরিশ্রমের কাজ শুরুতেই করবেন না। ধীরে ধীরে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করুন। এমনকি একবার কোভিড থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হলেও বা টিকার দুটো ডোজ নিলেও আবার রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আবার নতুন করে উপসর্গ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিন।

অনেকেই না বুঝে নিজের চিকিৎসা নিজে করছেন। ফল হিতে বিপরীত হচ্ছে। একমাত্র চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ নেবেন।

■ করোনা রোগের সর্ববিজ্ঞানীগ্রাহ্য ওষুধগুলো কী কী?

১. কর্টিকো স্টেরয়েড : মূলত ডেক্সামেথাজোন, প্রেডনিসোলোন, মিথাইল প্রেডনিসোলোন।

২. রেমডেসিভির : স্বল্পমেয়াদি পর্যবেক্ষণের পরে দেখা গেছে এই ওষুধ সুস্থতা ত্বরান্বিত করে। বিকল্প মতও রয়েছে।

৩. অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট (রক্ত তরল করার ওষুধ) : লো ডোজ অ্যাসপিরিনও ব্যবহার হচ্ছে।
৪. সেরে ওঠা কোভিড রোগীর রক্তরস : ভাবা হয়েছিল কার্যকারী হবে।
৫. মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি : বিশদ ফলের অপেক্ষায় থাকা।
৬. ডক্সিসাইক্লিনও দেওয়া হয় ক্ষেত্র বিশেষে।

■ করোনার জেরে কি হৃদরোগ হচ্ছে? হলে কখন?

হ্যাঁ হচ্ছে। বিশেষ করে যাঁদের করোনা গুরুতর বা অতিগুরুতর আকার নিচ্ছে তাঁদের অনেকের সেরে ওঠার পরও হার্ট অ্যাট্যাক হচ্ছে। আসলে করোনা রক্তের জমাট বাঁধার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়, তার জন্য হৃদযন্ত্রের ধমনিতে রক্ত জমাট বেঁধে যাচ্ছে, যাকে বলে করোনারি থ্রম্বোসিস তাতেই এটা হচ্ছে।

■ কাদের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা বেশি?

যাঁদের আগে থেকে মধুমেহ, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে চর্বির অসাম্য (Dyslipidemia) ইত্যাদি রোগ থাকছে তাঁদের বেশি হচ্ছে। তবে এসব না থাকলেও হতে পারে।

■ আটকানোর কোনো উপায় আছে?

পুরোপুরি হ্যাঁ বলা যাবে না। তবে অ্যাসপিরিন, হেপারিন ইত্যাদি ব্যবহার হচ্ছে প্রতিরোধের জন্য।

■ করোনা থেকে সেরে ওঠার পরে কি ফুসফুসের সমস্যা হতে পারে? হলে কাদের বেশি?

Post covid lung fibrosis বা ফুসফুস শুকিয়ে যাওয়ার অসুখ হতে পারে। যাদের শ্বাসকষ্টের অসুখ আগে ছিল তাদের অসুবিধের মাত্রা বাড়তে পারে।

■ এই ফুসফুসের সমস্যা এড়ানোর কোনো উপায় আছে?

কিছু ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে, তবে তা CT Scan করে বুঝে তবেই ব্যবহার করা উচিত।

■ টিকা নেওয়া কি আবশ্যক?

হ্যাঁ।

■ কোন টিকা বেশি ভালো?

আমাদের দেশে আপাতত দু'ধরনের টিকা পাওয়া যাচ্ছে— কোভিশিল্ড ও কোভ্যাক্সিন। প্রথমটি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার প্রযুক্তিতে সেরাম ইন্সটিটিউট অফ

ইন্ডিয়া প্রস্তুত করছে, দ্বিতীয়টি দেশীয় প্রযুক্তিতে ভারত বায়োটেক তৈরি করেছে। প্রথমটির ট্রায়াল সম্পূর্ণ, তার রিপোর্ট সন্তোষজনক। দ্বিতীয়টির ট্রায়াল সম্পূর্ণ হবার পথে, তবে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টগুলো সন্তোষজনক। দুটো টিকাই বেশ নিরাপদ এবং তাদের কার্যকারিতাও প্রায় তুল্যমূল্য। প্রথমটি করোনা ভাইরাসের একটি অংশ (স্পাইক প্রোটিন) থেকে তৈরি, তাই নতুন মিউট্যান্ট স্ট্রেনগুলোর বিরুদ্ধে কার্যকর হবার সম্ভাবনা কম। অন্যদিকে দ্বিতীয়টি সমগ্র করোনা ভাইরাস দিয়ে তৈরি বলে এটি নতুন মিউট্যান্ট স্ট্রেনগুলোর বিরুদ্ধেও একইরকম কার্যকর হবার সম্ভাবনা। বর্তমানে অতিমারির দ্বিতীয় তরঙ্গ আছড়ে পড়েছে এদেশে। অনেক নতুন নতুন মিউট্যান্ট স্ট্রেনের হদিশ মিলছে প্রায়শই। এই পরিস্থিতিতে কোভ্যাক্সিন বেশি কার্যকারী ভূমিকা নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

■ টিকায় মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা কতটা?

ট্রায়ালের রিপোর্ট এবং কোউইন পোর্টাল থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী টিকা নেওয়ার পর জ্বর-জ্বর ভাব, গা ম্যাজম্যাজ করা, বমি-বমি ভাব, ইনজেকশনের জায়গাতে ব্যথা, মাথাধরা ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে দশ শতাংশ টিকাগ্রহীতার মধ্যে। আরও দশ শতাংশের মধ্যে সত্যি সত্যিই জ্বর আসছে, দু-একদিন থাকছে, দু-একবার বমি হচ্ছে, ইনজেকশনের জায়গাটা ফুলে লালচে হয়ে থাকছে অথবা পেটে ব্যথা হচ্ছে। তার চেয়ে বেশি মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এক শতাংশেরও অনেক কম গ্রহীতার মধ্যে দেখা গেছে। টিকা নিয়ে মৃত্যুর ঘটনা সেভাবে সামনে আসেনি।

■ সুযোগ এলেও কাদের টিকা নেওয়া উচিত নয়?

গর্ভবতী মায়েদের সাধারণভাবে এই টিকা নিতে নিষেধ করা হচ্ছে, কেন না গর্ভস্থ ভ্রূণের ওপর এই টিকাগুলোর ঠিক কী প্রভাব, তা নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। তবে কোনো সন্তানসম্ভবা মহিলা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় থাকলে, যেমন কোভিড ওয়ার্ডে কর্মরতা স্বাস্থ্যকর্মী বা অন্য কোনো ফ্রন্টলাইন কর্মী হলে, তাঁদের টিকা নিয়ে নেওয়াটাই উচিত, একথা বলছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এছাড়া রক্ত তরল রাখার ওষুধ খেলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে কয়েকদিন ওষুধ বন্ধ রেখে টিকা নেওয়া উচিত হবে। অন্য কোনো জটিল রোগে ভুগলেও টিকা নেয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। যাঁরা এখন কোভিডে ভুগছেন, তাঁরা সেরে ওঠার অন্তত একমাস পর টিকা নিতে পারবেন।

■ সরকারি নির্দেশ ব্যতীত শিশুদের স্কুলে বা টিউশনে পাঠাবেন কি?

যদিও একবছর ধরে স্কুল-টিউশনি সব বন্ধ, তবু কোভিডের ভয়ংকর দ্বিতীয় তরঙ্গের মধ্যে স্কুল না খোলাই ভালো। দ্বিতীয় তরঙ্গে অল্পবয়স্করা অনেক বেশি সংখ্যায় আক্রান্ত হচ্ছে। সুতরাং সরকারি নির্দেশ ব্যতিরেকে স্কুল কলেজ খুললেও তাতে ছাত্রছাত্রীদের এখনই পাঠানো ঠিক হবে না।

■ খেলাধুলার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?

গত একবছর ধরে ছেলেমেয়েরা ঘরবন্দি। এতে তাদের মানসিক সমস্যা তো হচ্ছেই, তাছাড়াও অস্থি ও মাংসপেশির স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকের ভিটামিন ডি-এর অভাব দেখা যাচ্ছে। এই অবস্থায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে—

১. ইনডোর গেমস খেলতে উৎসাহ দেওয়া।
২. একই পরিবারের বাচ্চাদের মধ্যে আউটডোর গেমস খেলতে দেওয়া।
৩. বাড়ির ছাদে বা সামনের মাঠে ব্যায়াম, যোগাসন এবং শারীরিক সংস্পর্শ হয় না এমন খেলায় উৎসাহ দেওয়া।
৪. রানিং, জগিং, সাইক্লিং— এসবে উৎসাহ দেওয়া।
৫. বাড়ির বাইরে গিয়ে সাঁতার, ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলা আপাতত বন্ধ রাখাই ভালো।
৬. প্রাতিষ্ঠানিক জিম বা যোগা না করে এককভাবে করা ভালো।

■ এসময় গর্ভবতী মায়েদের প্রতি বিশেষ নির্দেশিকা

- অযথা বাড়ির বাইরে যাবেন না।
- জ্বর, কাশি বা অন্য উপসর্গ আছে এমন মানুষের থেকে দূরে থাকুন।
- কোনো উপসর্গ দেখা দিলে অতি শীঘ্রই ডাক্তার দেখান ও কোভিড পরীক্ষা করান।
- কোভিড হলেও গর্ভপাত হয় না। MTP করার প্রয়োজন নেই। কোভিড গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতি করে না।
- জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল গর্ভবতী মায়ের জন্য নিরাপদ।
- প্রচুর জল খান।
- বিশ্রাম নিন।
- সামান্য অসুবিধা হলেই হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।
- শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ালে টিকা নেবেন না।

কোভিড তৃতীয় তরঙ্গ: শিশুদের নিয়ে উৎকণ্ঠার বাস্তবতা

কোভিডের প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গের প্রেক্ষিতে জনমানসে তৃতীয় তরঙ্গ নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আমাদের দেশে টিকার অপ্রতুলতার কারণে এবং শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্করা টিকা পাওয়ায় মানুষের মনে এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে যে কোভিডের তৃতীয় তরঙ্গে শিশুরা বিশেষভাবে বিপদের মুখে। ভ্রান্ত তথ্যের ভিড় বিষয়টিকে আরও ভারাক্রান্ত করেছে।

এটা প্রথমেই বলে নেওয়া যাক যে তৃতীয় তরঙ্গ কিছু অনিবার্য পরিণতি নয়। তবে আমাদের দেশে অনেক মানুষের এই রোগের ব্যাপারে ঢিলে ঢালা মনোভাব এবং টিকাকরণে দীর্ঘসূত্রতার ফলে তৃতীয় তরঙ্গের সম্ভাবনা প্রবল। কবে সেটা আসবে বলা শক্ত - নানা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর সেটা নির্ভরশীল।

সর্বশেষ অ্যান্টিবডি - সুমারিতে (ডিসেম্বর ২০- জানুয়ারি ২১) দেখা গেছে যে ১০-১৭ বছর বয়সীদের মধ্যে ২৫ শতাংশের রোগের স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান এবং শতাংশের হিসাবে সেটা প্রাপ্তবয়স্কদের সমতুল। আশার কথা, ১০-১৭ বছর বয়সীদের মধ্যে রোগের ভয়াবহতা কম। কোষের গায়ে ভাইরাস সংযুক্ত হবার যে রিসেপ্টর থাকে সেটা এদের কোষে কম প্রকাশ পায়। তাছাড়া এদের ইমিউন সিস্টেম পৃথকভাবে কাজ করে। ফলস্বরূপ, এদের মধ্যে মৃদু বা মাঝারি উপসর্গ যুক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। একথা বলাই যায় যে ১০-১৭ বছর বয়সীদের ভয়াবহ রোগের সম্ভাবনা কম। এমনকি ভয়াবহ মাত্রার রোগের ক্ষেত্রেও প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় এদের আইসিইউতে ভর্তির হার কম।

কম বয়সীদের কখনও কখনও করোনার জটিলতা হিসাবে নিউমোনিয়া বা মাল্টি সিস্টেম ইনফ্লেমেটরি সিনড্রোমের শিকার হতে দেখা গেছে কিন্তু সেটা প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ১-২ জন মাত্র। জটিলতা হলেও প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে সেটা চিকিৎসা যোগ্য। বাচ্চাদের করোনা হলে অধিকাংশ গৃহ চিকিৎসায় সেরে যায়।

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে যেসব সাবধানতা বিধি - অর্থাৎ যথাযথ মাস্ক ব্যবহার, হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার বা দুরত্ববিধি মেনে চলা উচিৎ সেগুলো শিশুদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শিশুদের টিকা (১২-১৮ বয়সের) নিয়ে আমাদের দেশে কাজ চলছে। বিদেশে এমনকি ৩ বছরের বেশি বয়সীদের টিকার ট্রায়াল চলছে।

পরিশেষে বলার যে - বাচ্চাদের কোভিড হতে পারে কিন্তু সেটা মারাত্মক হবার সম্ভাবনা প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় কম। যথাযথ কোভিড বিধি মেনে চললে এখনই এ নিয়ে আতঙ্কিত হবার কারণ নেই।

কালো ছত্রাক বা মিউকরমাইকোসিস

অতিমারি আবহেই কোভিড আক্রান্তদের শরীরে দেখা দিচ্ছে 'ব্ল্যাক ফাঙ্গাস' নামক এক প্রকার ছত্রাকের সংক্রমণ। যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় বলা হচ্ছে মিউকরমাইকোসিস। মূলত দুর্বল শরীরেই বাসা বাঁধে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস। ফলে করোনা রোগীর শরীরে যখন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, তখনই এটি আক্রমণ করে।

ব্ল্যাক ফাঙ্গাস একটি বিরল ছত্রাক সংক্রমণ। এটি শরীরে দেখা দিলে রোগীর মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। কোভিড সংক্রমণ থেকে রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেও তাঁর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়। মূলত যে সব রোগীকে দীর্ঘদিন আইসিইউ-তে রেখে চিকিৎসা করা হয়েছে এবং যাঁদের অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবিটিস রয়েছে, অনেকদিন কড়া ডোজে স্টেরয়েড পেয়েছেন বা অঙ্গ প্রতিস্থাপন হয়েছে তাঁদের শরীরেই এই জাতীয় সংক্রমণ বেশি দেখা যাচ্ছে।

যদি এই ছত্রাকের সংক্রমণ হয় তবে গাল, চোয়াল, চোখ বা মাথার একপাশে বা উভয় দিকেই হতে পারে। চোখ ও নাকের পাশে ব্যথা ও কালচে ভাব, প্রচন্ড জ্বর, মাথা ব্যাথা, কাশি, শ্বাস কষ্ট, চোখ লাল, নাক দিয়ে কালচে সর্দি, মুখের মধ্যে কালো ঘা, দাঁতে ও গালে প্রচন্ড ব্যথা, হঠাৎ করে একটা দাঁত বাইরে বেরিয়ে আসা, চোখে ঝাপসা দেখা ইত্যাদি এক বা একাধিক উপসর্গ থাকতে পারে। ছত্রাক নাক থেকে চোখ হয়ে সাইনাস মারফৎ মস্তিষ্কেও পৌঁছে যায়, সেক্ষেত্রে বেঁচে গেলেও পঙ্গুত্বের সম্ভাবনা থেকে যায়।

এই রোগ সবার ক্ষেত্রে ছোঁয়াচে নয়। ফলে এটি সরাসরি একজনের দেহ থেকে অন্যের দেহে যেতে পারে না।

এই রোগ প্রতিরোধের জন্য দরকার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা, প্রয়োজন ছাড়া স্টেরয়েড বা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দীর্ঘদিন না খাওয়ানো, কোনো কারণে ইমিউনিটি দুর্বল, এমন মানুষ বাগানের কাজ বা পচনশীল জৈব পদার্থ হাত দেওয়ার সময় গ্লাভস, মাস্ক, গামবুট ইত্যাদি পরবেন। অক্সিজেন চললে তার জল ও নলের উপযুক্ত পরিচ্ছন্নতা দরকার।

এই রোগের চিকিৎসায় অ্যাম্ফোটেরিসিন বি নামক ছত্রাকনাশক ওষুধ স্যালাইনের সঙ্গে শিরার মাধ্যমে দিতে হয়। তাছাড়া সার্জারি করবার প্রয়োজন হতে পারে অনেক ক্ষেত্রেই।

পরিশেষে আবার বলি অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস নেই বা কোনো কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়নি, এমন মানুষের এই রোগ থেকে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

■ কোভিড-যোদ্ধা স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে স্টুডেন্টস্ হেল্‌থ হোমের আবেদন—

১। যখন কোনো রোগীর বাড়ি যাবেন, তখন অবশ্যই ডাবল মাস্ক অর্থাৎ প্রথমে N95 ও তার ওপরে সার্জিক্যাল মাস্ক পরবেন। তার সঙ্গে ফেস শিল্ড পরবেন (এটা ড্রপলেট চোখের নেত্রনালি দিয়ে নাকে প্রবেশ করা থেকে অনেকটাই আটকায় এবং নিজ হাতকেও মুখমণ্ডল স্পর্শ করতে দেয় না)। সার্জিকাল মাস্কটি একবার পরে উপযুক্ত জায়গায় ফেলবেন। N95 মাস্ক ৩/৪টি রাখুন একটি পরে নিরাপদ স্থানে ঝুলিয়ে রেখে ৩ বা ৪ দিন পর সেটি ফের পরা যাবে।

২। রোগীর ঘরে AC যদি চলে তবে তা বন্ধ করিয়ে জানালা-দরজা খুলে ফ্যান চালিয়ে দেওয়ার অন্তত ১০ মিনিট পর রোগীর ঘরে ঢুকবেন। এতে বদ্ধ ঘরের ভাইরাল লোড অনেকটাই কমে যায়। রোগী খুব ছোট খুপচি ঘরে থাকলে খোলা জায়গায় আনিয়ে দেখুন। রোগীর বাড়ির লোক সকলে যেন মাস্ক পরে, আপনি ঢোকার আগে তা নিশ্চিত করবেন অবশ্যই।

৩। প্রথমে রোগীর ডানহাতের মধ্যমা পরিস্কার ও স্যানিটাইজ করে ৩ মিনিট পাল্‌স অক্সিমিটার দিয়ে অক্সিজেন লেভেল দেখতে হবে। তারপর সেই অক্সিমিটার স্যানিটাইজ ও পরিস্কার করে রাখতে হবে। যদি অক্সিজেন মাত্রা ৯৪% এর নীচে থাকে অথবা রোগের প্রথমদিকে রোগী ৬ মিনিট হাঁটার পরে যদি অক্সিজেন ৩ বা ৪ শতাংশ কমে যায় তবে নিজেরা কোনোরকম বুদ্ধি না দিয়ে ডাক্তারদের সাথে কথা বলতে হবে।

মনে রাখতে হবে অক্সিজেন আমরা অ্যাম্বুলেন্স আসতে যেটুকু সময় লাগে শুধু সেটুকু সময় দেব। অক্সিজেন নল ও জলের সর্বাধিক পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে।

অক্সিজেন না থাকলে প্রনিং বা উপুড় হয়ে শুতে বলবেন (বিশদ পদ্ধতি সঙ্গে দেওয়া হল)।

অক্সিজেন একটা ওষুধ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে ক্ষতি করে। এক্সপার্ট নাহলে বেশিক্ষণের জন্য অক্সিজেন চালাবেন না। যেমন অক্সিজেন লেভেল ৯৪ থেকে ৯০ থাকলে ফ্লো হওয়া উচিত ৬ লিটার প্রতি মিনিট।

৪। গ্লাভস পরে থাকলে (বাধ্যতামূলক নয়) রোগীর বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে খুলে কোনো প্লাস্টিক ব্যাগে সাবান বা সার্ফ গোলা জলে রেখে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় নষ্ট করতে বলবেন, বাইরে যেখানে-সেখানে নয়। ভুলেও কোনোরকম ভালোবাসায় রোগীর বাড়ির জল, চা কিংবা খাবার গ্রহণ করবেন না।

৫। এরপর সোজা কোথাও না দাঁড়িয়ে বাড়ি গিয়ে জামা-কাপড় সাবানে ডুবিয়ে হাত-পা-মুখ সাবান দিয়ে রগড়ে রগড়ে ধুতে হবে।

৬। রোগী দেখে বেরিয়ে মাস্ক নামিয়ে সিগারেট বা চা/কফি খাওয়ার পরিণাম মারাত্মক হতে পারে।

৭। রোগীর বাড়ির লোককে ট্র্যাকিং চার্ট (সঙ্গে দেওয়া হল) তৈরি করার পরামর্শ দিন। চার্টে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় অন্তর অক্সিজেন লেভেল, ব্লাড প্রেসার, গ্লুকোমিটারে সুগার লেভেল (মূলত ডায়াবেটিস থাকলে) এবং জ্বর থাকলে তার পরিমাপ, পারলে পাল্‌স এরকম সহজ কিছু জিনিস লেখা থাকবে। বাড়ির লোক তার ছবি তুলে নিজেরা বা স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে ডাক্তারদের পাঠাবেন। এটি পরবর্তী চিকিৎসায় খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৮। স্বেচ্ছাসেবকরা ১৫ দিন রোগীর বাড়িতে গেলে বাকি ১৫ দিন বাড়িতে বিশ্রাম নেবেন অথবা কোভিড স্বেচ্ছাসেবীদের কেন্দ্রীয় অফিসে কাজ করবেন। এইসময় অন্য দল রোগীর বাড়িতে যাবে।

৯। পরিসেবা প্রদান কালে স্বেচ্ছাসেবকদের কমপক্ষে আট ঘণ্টা ঘুম, সঠিক খাওয়া আর অবশ্যই লঘু ব্যায়াম খুব দরকার।

১০। কোনো কোভিড পজিটিভ রোগী মারা যাবার পর ডেথ সার্টিফিকেট পেতে অসুবিধা হলে তাঁদের বলতে হবে স্বাস্থ্য দপ্তরে যোগাযোগ করতে। স্থানীয় কর্পোরেশন/পৌর প্রশাসন সার্টিফিকেট দেবার বন্দোবস্ত করতে দায়বদ্ধ। গ্রামীণ এলাকায় আশা কর্মীর মাধ্যমে BMOH সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন।

১১। রোগীর বাড়ির অন্য সবাই যাতে কোভিড টেষ্ট করেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ-পাল্‌স রেটের স্বাভাবিক মান ৭০ থেকে ১০০, ১১০ ও মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু বিশ্রামরত অবস্থায় তার বেশি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ জরুরি। ব্লাড প্রেসার খুব বেশি হলে ১৪০/৯০ অব্দি সহনশীল। তার বেশি হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া দরকার। প্রত্যেকটি মেশিনের ব্যাটারি যেন ঠিক থাকে।

সবার শেষে আবারও মনে করিয়ে দেওয়া যে স্বেচ্ছাসেবকদের সুস্থ থাকতে হবে সমাজের জন্য। তাই সাবধানতা অবলম্বন করে রোগীর পাশে থাকুন। সাপুড়ে যেন সাপের কামড় না খায়।

———

আপনার জিজ্ঞাসা
চিকিৎসকদের পরামর্শ

করোনা
ব্ল্যাক ফাঙ্গাস
তৃতীয় ঢেউ

স্টুডেন্টস্ হেল্‌থ হোম
১৪২/২ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৪
ফোন : ২২৪৯২৮৬৬
ই-মেল : healthhome1952@gmail.com

CORONA BLACK FUNGUS TRITIYO DHEU
(Book on Covid-19 and advice by doctors)

© STUDENTS' HEALTH HOME

প্রকাশকাল : ১৭ এপ্রিল, ২০২১
দ্বিতীয় সংযোজিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : ১৩ মে, ২০২১

প্রকাশক : স্টুডেন্টস্ হেল্‌থ হোম

বর্ণগ্রন্থন
জি ডি আর কম্পিউটার সেন্টার
৬ডি, কৃষ্ণরাম বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪

প্রিন্টিং উদ্যোগ
১৯ডি/এইচ/১৪, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক
পান প্রিন্টার্স
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

পরিবেশক
স্টুডেন্টস্ হেল্‌থ হোম

STUDENTS' HEALTH HOME

Chart for COVID patient

রোগীর নাম : ______________________________ বয়স : ________ বছর, পুরুষ / স্ত্রী রোগীর ঠিকানা : ____________________________________

রোগীর অন্য অসুস্থতা (comorbidity) সম্পর্কিত তথ্য : ____

<u>যেদিন প্রথম উপসর্গ দেখা দিল সেদিন প্রথম দিন বা DAY 1 ধরতে হবে</u>

দিন ও সময়	জ্বর (FEVER)				অক্সিজেন লেভেল (SPO2)				পালস্ রেট (Pulse Rate)			প্রেসার (Blood Pressure)			শ্বাস (Breathing)			সুগার (Glucose)		ভালো লাগার স্তর 0 থেকে 10 স্কেলে
	8am	2pm	8pm	12am	8am	2pm	8pm	12am	8am	4pm	12am	8am	4pm	12am	8am	4pm	12am	FBS	PPBS	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				

ঠিকভাবে মাস্ক পরে থাকি সব দূরে দূরে
রেখেছি মনেতে জোর রাত কেটে হবে ভোর

প্রশ্নগুলির উত্তর যাঁরা দিয়েছেন

ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য্য
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

অধ্যাপক ডাঃ অপূর্ব মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান
মেডিসিন বিভাগ
আর জি কর মেডিকেল কলেজ

অধ্যাপক ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ কাজলকৃষ্ণ বণিক
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

অধ্যাপক ডাঃ জয়দীপ দেব
বিভাগীয় প্রধান
বক্ষরোগ বিভাগ
নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ

অধ্যাপক ডাঃ সৃজিত ঘোষ
বিভাগীয় প্রধান
মনোরোগ বিভাগ
ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

অধ্যাপক ডাঃ অসীম কুণ্ডু
বিভাগীয় প্রধান, অ্যানিস্থেশিওলজি
কলকাতা মেডিকেল কলেজ

অধ্যাপিকা ডাঃ রুনা বল
স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ
নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ

অধ্যাপক ডাঃ বিশ্বজিৎ মজুমদার
হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ চিন্ময় নাথ
অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ স্বাগত মুখার্জি
মেডিকেল অফিসার ও নোডাল অফিসার
এন ইউ এইচ এম
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

ডাঃ সুকান্ত চক্রবর্তী
প্যাথলজিস্ট
এন. এ. বি. এল. লিড এসেসর

ডাঃ সৌমিত রায়
শিক্ষক চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

ডাঃ বিমান রায়
শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ অরিষ্ঠ লাহিড়ি
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ
কমিউনিটি মেডিসিন
সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ

পরিকল্পনা ও বিন্যাস : চন্দন নস্কর, অন্বয় চ্যাটার্জী ও অভয় ঘোষাল
স্টুডেন্টস্ হেল্‌থ হোমের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক
ডাঃ পবিত্র গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।